৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১৩

টপিক:

সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা-১:

সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ (সাধারণ আলোচনা ও নিয়মাবলি)

রচনা (উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিবেশ বিষয়ক, সামাজিক বিষয়াবলি, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক, সাম্প্রতিক বিষয়াবলি)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

সারাংশ/সারমর্ম

- **সারাংশ:** গদ্য রচনার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারাংশ। ইংরেজিতে বলা হয় 'Precis' বা 'Summary'। সাধারণত একটি বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে লিখিত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের মূল বা সার বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলে, তাকে বলে সারাংশ। মোটকথা মূল রচনার সারবস্তুটিকে ব্যক্ত করার নামই সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার।

- **সারমর্ম:** কাব্যভাষায় লেখা কোনো রচনার মূলভাবকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারমর্ম। সারমর্মকে মর্মার্থও বলা হয়ে থাকে। সারমর্ম অনেকটা ভাব-সম্প্রসারণের বিপরীত। ভাব-সম্প্রসারণে ভাবকে বর্ধিত আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে সম্প্রসারণ করতে হয়। কিন্তু সারমর্মে মূল ভাবের অর্থটি প্রকাশ করতে হয়।

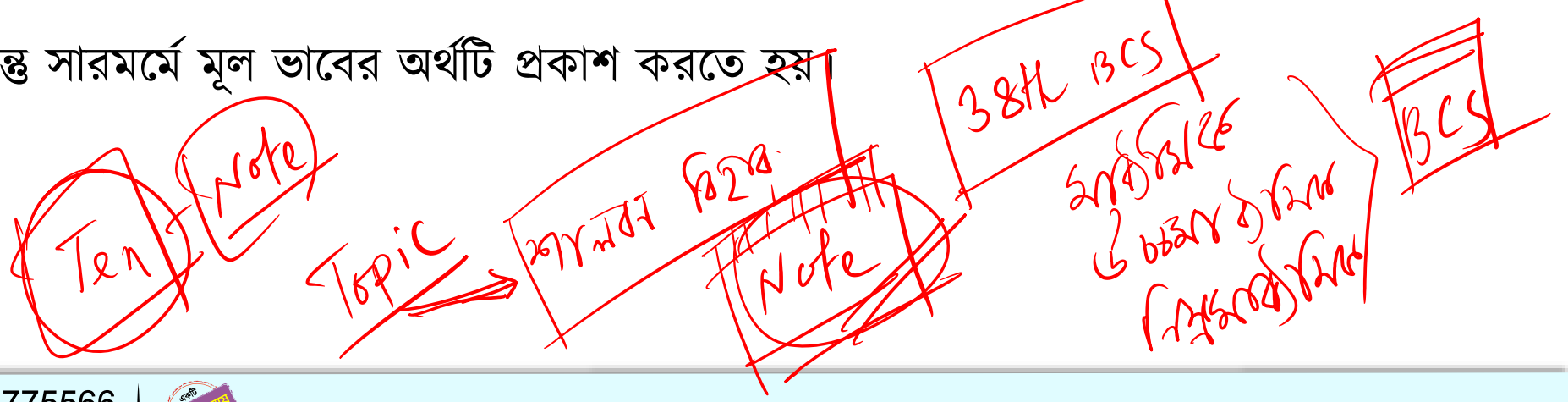

সারাংশ/সারমর্ম

❑ সারাংশ / সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে যা করা উচিত:

- যে অংশের সারাংশ বা সারমর্ম লিখবেন তা বার বার মন দিয়ে পড়ে মূল ভাবটিকে খুঁজে নিতে হবে।
- সারাংশ বা সারমর্ম একটি অনুচ্ছেদে লেখা উচিত।
- প্রধান প্রধান শব্দে দাগ দিবেন। দাগাঙ্কিত শব্দের বাক্যগুলো আবার পড়ে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। তারপর লেখা শুরু করবেন।
- প্রারম্ভিক বাক্যটি গোছালো ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবেন। এতে পরীক্ষক শুরুতেই চমৎকৃত হন।
- প্রসঙ্গ বাক্য (মূল ভাবটুকু প্রকাশের চুম্বক বাক্য) সারমর্ম বা সারাংশের প্রথমে থাকলে ভালো। তা প্রয়োজনে মধ্যে কিংবা শেষেও থাকতে পারে।
- মূলে প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তা পরোক্ষ উক্তিতে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবেন।
- সারমর্ম বা সারাংশ লেখার জন্য প্রথমে প্রদত্ত রচনার মূল ভাবটুকুর আলোকে একটি প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করানো ভালো। তারপর প্রয়োজনমত পরিমার্জন করে পুনর্লিখন করবেন।
- প্রদত্ত অংশে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ও গভীরতার উপর সারমর্ম বা সারাংশ মূলের সমান, অর্ধ, এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হতে পারে।
- সারাংশ বা সারমর্ম যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও সরল বাক্যে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে।
- লেখা শেষে পড়ে দেখা যে, কোনো মূল বিষয় বাদ গিয়েছে কী না। গেলে তা সংযোজন করে পুনরায় লেখা।

সারাংশ/সারমর্ম

❑ সারাংশ / সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে যা করা উচিত নয়:

- মূল ভাবকে যেহেতু খুব সংক্ষেপে লিখতে হয়, সেজন্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থাকলে তা বাদ দিতে হবে। কখনই নিজের কোন মতামত দেওয়া যাবে না।
- উপমা, অলংকার, রূপক ইত্যাদি বর্জন করতে হবে।
- মূলভাবের বাইরে অন্য কিছুর অবতারণা করা উচিত নয়। রচয়িতার নাম জানা থাকলেও উল্লেখ করা যাবে না। কবি বলেছেন, 'এই জাতীয় কথাও লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।'
- সারাংশ বা সারমর্মের বক্তব্যে উত্তম পুরুষ (আমি/আমরা) বা মধ্যম পুরুষ (তুমি/তোমরা) দিয়ে বাক্য কখনোই লেখা যাবে না।
- মূল অংশের কোন অংশের সরাসরি উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকবেন ও লক্ষ্য রাখবেন কোন অংশের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

সারাংশ/সারমর্ম

❑ নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম: পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর, এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা।

[৪৪তম বিসিএস]

সারাংশ: মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজেই নিজের আত্মিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে। অপর দিকে তরুলতা কিংবা অন্যান্য জীবজন্তু প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে উঠে। প্রত্যেকেই বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু কেবল মানুষই আত্মিক ও দৈহিক বৃদ্ধি লাভ করে। আর এই আত্মিক বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ যর্থাথ মানুষ হয়ে গড়ে উঠে।

সারাংশ/সারমর্ম

❑ প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাশ করাটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে পরীক্ষা পাশ করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানের। যেখানেই পরীক্ষা পাশের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে পরিচয়লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে আকৃষ্ট করতে হবে। পরীক্ষা পাশের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনোই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

[৪৩তম বিসিএস]

সারাংশ: শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের আগ্রহ না থাকলে সেই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যেই স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিহিত। শুধু পরীক্ষা পাশের চিন্তা-ভাবনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জ্ঞানচর্চার মনোনিবেশ করাটাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সারাংশ/সারমর্ম

❑ জীবনের একটা প্রত্যক্ষ মূল্যবান উপকরণ হলো হাসি ও আনন্দ। প্রত্যেক কাজে যার আনন্দ তার চেয়ে সুখী আর কেউ নয়। জীবনে যে পুরোপুরি আনন্দ পেতে জানে আমরা তাকে দেখে বিস্মিত হই। কারণ নিত্যকার কাজের ভেতর সে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে যা তার নিজের জীবনকে সুন্দর ও শোভন করেছে এবং পরিপার্শ্বসহ আরও দশজনের জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছে। এই যে এমন এক অমূল্য স্ফূর্তি যার ফলে সংসারকে মরুভূমি বলে বোধ না হয়ে পারিজাত কানন বলে মনে হয়, এই বোধের সন্ধান সকলে পায় না যে পায় সে ভাগ্যবান। এমন আনন্দময় মানুষের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখান থেকে পঙ্কিলতা আপনা-আপনি দূরে পালায়। সেখানে প্রেম-পবিত্রতা সর্বদা বিরাজ করে। **[৪১তম বিসিএস]**

সারাংশ: সুখ-দুঃখের এ পৃথিবীতে জীবনের প্রতিক্ষণে আনন্দ উপভোগ করা খুব সাধনার কাজ। যে পারে সে পরম ভাগ্যবান। এরূপ লোকের সংখ্যা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজে তত শান্তি বিরাজমান। কারণ, তারা সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে সুখ বিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

সারাংশ/সারমর্ম

- মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় জগতের একটি প্রাণীরও নাই। সুতরাং এই অবধারিত সত্যকে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়াও মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য একটি বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে, অতীতের পূর্বপুরুষদের সাধনাকে নিজের জীবনে এমনভাবে রূপান্তর করা যেন ইহার ফলে তোমার বা আমার মৃত্যুর পরেও সেই সাধনার শুভফল তোমার পুত্রাদিক্রমে বা আমার শিষ্যাদিক্রমে জগতের মধ্যে ক্রমবিস্তারিত হইতে পারে। মৃত্যু তোমার দেহকেই মাত্র ধ্বংস করিতে পারিল, তোমার আরব্ধ সাধনার ক্রমবিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না– এখানে মহাপরাক্রান্ত মৃত্যুর আসল পরাজয়। **[৪০তম বিসিএস]**

সারাংশ: মানুষ মরণশীল। মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী তবুও নিজ কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। কারণ মৃত্যু কেবল দেহকে ধ্বংস করে, মহৎ কীর্তিকে নয়।

সারাংশ/সারমর্ম

- যে মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রোদ বৃষ্টি লাগে না, তাহা আরামে থাকতে পারে বটে, কিন্তু সে আরামে কেবল দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোনো প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কোনো প্রবাহ নাই। এজন্যে আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন বিশেষ তেজ, সাহস বা প্রতিভা দেখা যায় না। আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের বালক-বালিকাদের মনে স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্বলাভের শক্তিতে বিশ্বাসী এবং অন্যদিকে জাতির উন্নতির চরম ও পরম লক্ষ্যে মাতোয়ারা করিতে হইবে। আমাদের সন্তানদের মনে একবার আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহারা তাহাদের গন্তব্যপথ তাহা যতই বিঘ্নবহুল ও বিপদসংকুল হউক না কেন, যতই দুর্গম ও দুরারোহ হউক না কেন- তাহা ধরিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণশিখরে উপস্থিত হইবে।

সারাংশ: উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শহীন জাতি মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেও সাহস বা প্রতিভা লক্ষ করা যায় না। শিশুদের যদি স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্বের শক্তিতে আত্মবিশ্বাসী করে আপন লক্ষ্যে স্থির রাখা যায়, তবে তারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবেই।

সারাংশ/সারমর্ম

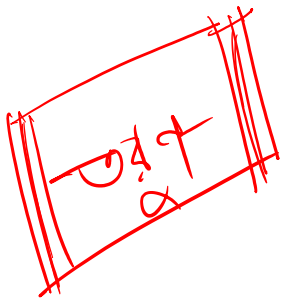

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

[৪৪তম বিসিএস]

সারমর্ম: আঠারো বছর বয়স প্রদীপ্ত ও উদ্দীপনার বয়স। এ বয়স প্রবল আবেগ ও ঝুঁকি নেওয়ার বয়স। এ বয়সে নানা ঘাত প্রতিঘাতে জীবন ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তি, দুর্বার সাহসিকতা, নবজীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই বয়স কখনো মাথা নত করে না। তাই এই বয়স হতে পারে জাতীয় অগ্রযাত্রার চালিকা শক্তি।

সারাংশ/সারমর্ম

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়;
সমুদ্র-সাগর তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য কর অন্য কোনো জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা
রত হয় নিজ নিজ কাজে।

[৪৩তম বিসিএস]

সারমর্ম: এ পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের কর্মের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে আছেন। জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিরা যে পথে চলে অমরকীর্তি স্থাপন করে গেছেন, সে পথ অনুসরণ করে রেখে যেতে পারে আপনকীর্তি। তাই নশ্বর পৃথিবীতে বৃথা সময় নষ্ট না করে নিজের সাধনা ও কর্ম করা উচিত, তবেই জীবন সার্থকতা পাবে।

সারাংশ/সারমর্ম

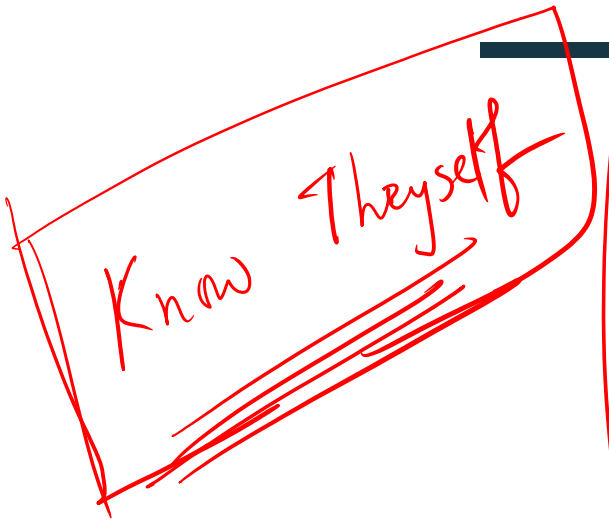

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি -কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

[৪১তম বিসিএস]

সারমর্ম: মানুষের মধ্যেই রয়েছে সকল ধর্মগ্রন্থ, চিরকালের চিরন্তন জ্ঞান। মানুষের হৃদয়-মন্দিরই সকল দেবতার পবিত্র বাসভূমি। তাই মৃত ধর্মগ্রন্থের কঙ্কালের মধ্যে দেবতাকে অন্বেষণ করার মতো বোকামি আর নেই। দেবতাকে ধর্মগ্রন্থে খুঁজতে গেলে স্বয়ং দেবতাই মানব-হৃদয়ের অন্তরালে থেকে মুচকি হাসেন।

সারাংশ/সারমর্ম

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা। [৪০তম বিসিএস]

সারমর্ম: উদ্দীপনার প্রতীক নবীনরাই পারে সমাজের সকল জরা, কুসংস্কার ও অন্ধত্বের শৃঙ্খল মুক্ত করে সমাজকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে। নতুন দিনের প্রতীক্ষায় তরুণরা সব বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সগৌরবে এগিয়ে চলে। পৃথিবীর জীর্ণতাকে দূর করতে নবীনদের আগমনই সকলের কাম্য।

সারাংশ/সারমর্ম

Seven

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

[৩৮তম বিসিএস]

সারমর্ম: সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান। প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে এবং যথেষ্ট কষ্ট করে মানুষ দূর-দূরান্তে সৌন্দর্য দেখতে ছুটে যায়। কিন্তু ঘরের কাছে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

সারাংশ/সারমর্ম

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়-
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দির-মাঝে।

সারমর্ম: সংসারী মানুষ সংসারের মায়া-মমতা, বন্ধনের মধ্যে থেকেই স্রষ্টার আরাধনা করতে চান। সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে তিনি বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করতে চান না। সংসারই তার কাছে তীর্থস্থান যেখান থেকে তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে চান।

ভাব-সম্প্রসারণ

শব্দটি বহু অর্থবাচক, অর্থাৎ একাধিক অর্থ বহন করে এবং এর ব্যবহারও বহুমাত্রিক। এখানে 'ভাব' শব্দটির অর্থ 'মর্ম' বা 'নিগূঢ় অর্থ'। আমরা জানি, সাহিত্যমাত্রই ভাবাশ্রয়ী। গদ্য কিংবা কাব্য যেকোনো রীতির সাহিত্যে সাহিত্যিকের 'অনুভূতির গাঢ়তা' (Emotion) লুকিয়ে থাকে। একে বলা হয় সাহিত্যের ভাব। তাহলে শাব্দিক অর্থে, ভাব-সম্প্রসারণ বলতে 'ভাব'-এর তথা 'অনুভূতির গাঢ়তা'-এর প্রসারণকেই বোঝায়। যে কোনো রীতির সাহিত্যের দু'একটি চরণে বা অংশে একটি 'ভাব' বা 'নিগূঢ় অর্থ' প্রচ্ছন্ন থাকে, যা মানবজীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যথাযথ যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সহজবোধ্য ভাষায় সেই গভীর 'ভাব'-এর প্রসারণকে ভাব-সম্প্রসারণ বলা হয়। সহজ কথায়, ভাব-সম্প্রসারণ হলো প্রাঞ্জল ভাষায় কোনো উদ্ধৃত সাহিত্যাংশের মূলভাবের বিস্তৃতি ঘটানো।

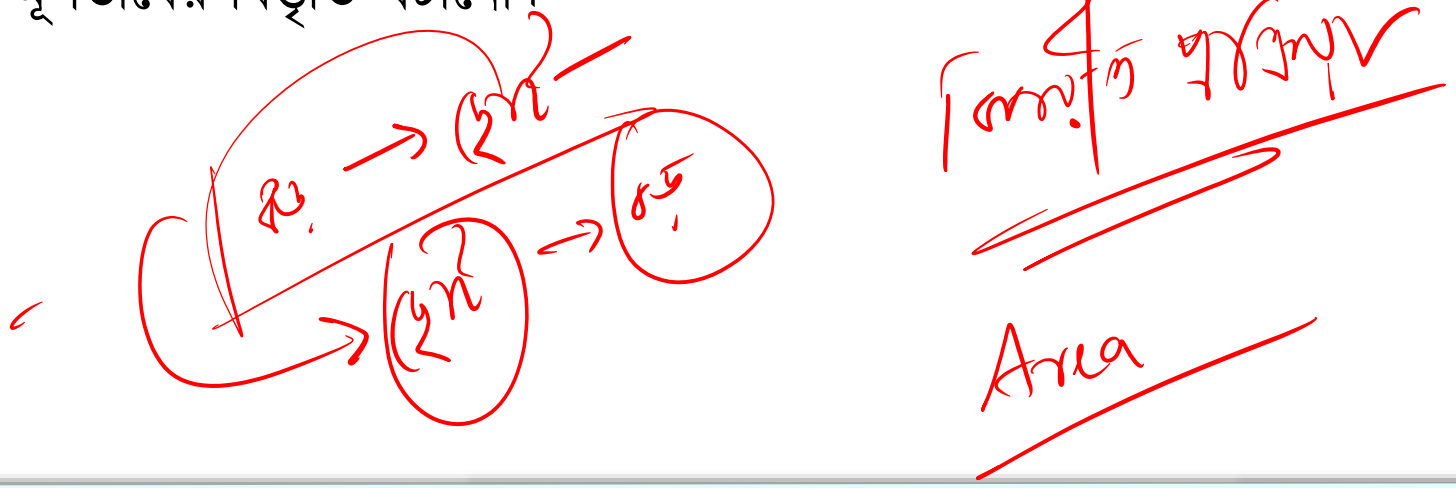

ভাব-সম্প্রসারণ

❑ ভাব-সম্প্রসারণের কিছু নিয়ম:

ভাব- সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন –

- প্রথমে প্রদত্ত অংশটুকু ভালোভাবে পড়তে হবে। লেখকের রসঘন অর্থবহ রচনার মূল্যবান অংশ, কবিগণের ভাবগর্ভ ও উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি, প্রবাদ-বচন ইত্যাদি যেসব অংশ ভাব-সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়, তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারলে ভাব-সম্প্রসারণ সহজ হয়ে যায়।
- ভাব-সম্প্রসারণকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে ভাবের অর্থ, দ্বিতীয় অংশে ভাবের ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন।
- অধিকাংশ বিষয়ের দুই ধরনের অর্থ থাকে। শাব্দিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ। তাই শাব্দিক অর্থকে ব্যাখ্যা করে অন্তর্নিহিত অর্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা উচিত। মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ-উপমা দেওয়া যেতে পারে। তবে উপমা অবশ্যই মূল বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- আলোচ্য অংশ মানব জীবনের যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- উদ্ধৃত অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলো যে ভাবের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে যথার্থভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণ

- ভাব-সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা নয়। তাই ব্যাখ্যাংশের মতো রচনার নাম, রচয়িতার নাম, প্রসঙ্গ কথা ইত্যাদি উল্লেখ করা যাবে না। যেমন – কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, লেখকের মতে ..... ইত্যাদি লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রদত্ত অংশটুকু প্রাসঙ্গিক হলে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অপ্রয়োজনীয় কথা ও কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সম্প্রসারিত ভাব লেখার আয়তন হবে বরাদ্দকৃত নম্বর অনুযায়ী।
- কোনটি বাড়তি তথ্য ও কোনটি আপনার অভিমত, পড়া মাত্র যেন এ দুইয়ের পার্থক্য বোঝা যায়। নচেৎ ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে।
- বক্তব্য যেন দৃঢ়বদ্ধ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাক্যের সাথে বাক্যের ও অনুচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের সম্পর্ক ঘটাতে হবে, সঙ্গতি রাখতে হবে। নাহলে বক্তব্যের স্বাভাবিক চলন ব্যাহত হবে। অর্থাৎ এমনভাবে লিখতে হবে যাতে ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিদ্যমান থাকে।
- একই অনুচ্ছেদে একই সাথে কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য ব্যবহার করা যাবে না। এতে রচনার গঠনগত সৌন্দর্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।
- সব সময় একই দৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহার না করা। এতে একঘেয়েমি চলে আসে।
- সর্বোপরি সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার করা।

ভাব-সম্প্রসারণ

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো [৪৪, ৪১, ৩২তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ:

মানুষের জীবনের মূল্য ও মর্যাদা তার জন্ম আর বংশ পরিচয়ে নয়, বরং তার কর্মফল দিয়ে নির্ণয় করা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও বহুলোক আপন কর্মের জন্য পৃথিবীর বুকে স্বনামধন্য হয়েছেন। আবার অনেকেই অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও আপন দুষ্কর্মের ফলে সমাজের নিন্দা ও ঘৃণা কুড়িয়েছে। সুতরাং কর্তব্য পরায়ন কর্মময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরাই হলেন প্রকৃত আশরাফ বা অভিজাত। এসব ব্যক্তি বিধাতার আশীর্বাদে পৃথিবীতে অনেক সুকঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ভালো কাজের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পক্ষান্তরে, যারা কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে না, তাদেরকে কেউ মনে রাখে না। হতে পারে তার জন্ম উঁচু ও অভিজাত বংশে কিন্তু কর্মের বিবেচনায় সে কালের প্রবাহে হারিয়ে যায়। এসব ব্যক্তিকে কেউ মনে রাখে না বা রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, কর্মহীন মানুষ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার কর্মে, বংশে নয়। বর্তমান যুগে মানুষের ধ্যানধারণা ও চেতনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ধর্মীয় বিধির ওপর ভিত্তি করে আশরাফ-আতরাফ নির্বাচনে এখন মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। মানুষের কর্মই নির্ধারণ করে সে আশরাফ নাকি আতরাফ।

আমরা বলতে পারি, সর্বজনীন পূণ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরাই হলেন প্রকৃত আশরাফ বা অভিজাত। সুকর্মই মানুষের মর্যাদা, মানুষের আভিজাত্য।

ভাব-সম্প্রসারণ

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই । [৪৪তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সকল উপাসনালয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাসনালয় হল মানুষের হৃদয়। কারণ পবিত্র হৃদয় থেকেই স্রষ্টাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

মানুষ তার মন, হৃদয়, সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এ মানুষই পারে স্রষ্টাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ধারণ করতে। বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় মানুষের সমকক্ষ আর কোনো প্রাণী নেই। মানুষের রয়েছে বিচার ও বিশ্লেষণের শক্তি। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পণ্য বিচার করে চলা মানুষের ধর্ম। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে মানুষের মন। মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ করে এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করে। স্রষ্টা অন্তর্যামী। মানুষের হৃদয়ের খবরাখবর তিনি রাখেন। তাই তাঁকে পেতে হলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে হবে। যাঁরা নির্মল হৃদয়ের অধিকারী তাঁরাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। মিথ্যা, কপটতা এবং হীনমন্যতায় যাদের হৃদয় পরিপূর্ণ তাদের মসজিদে মন্দিরে গিয়ে লাভ নেই। তারা যতই সেজদা অথবা পূজা-অর্চনা করুক না কেন, তাতে কোনো কাজ হবে না। কেউ কেউ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মসজিদে-মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করে। কিন্তু তার হৃদয় যদি কলুষমুক্ত না হয়, তাহলে রাতভর আরাধনা করেও কোনো লাভ হবে না। এক হাজারটি কাবা শরীফ কিংবা মন্দির সমান একটি অন্তর। অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধ না করে কাবা শরীফে বা মন্দিরে গিয়ে কোনো লাভ নেই। পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাদেরকে কাবা শরীফ বা মন্দিরে যেতে হয় না- তাঁরা সহজেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেন। কাবা বা মন্দিরের চেয়ে হৃদয়ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। নির্মল হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাঁরাই সৃষ্টি কর্তাকে কাছে পেয়ে থাকেন।

কাবা বা মন্দির নয় মানুষের হৃদয় হচ্ছে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ অবস্থান। পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাঁরাই সৃষ্টি কর্তাকে কাছ থেকে অনুধাবন করতে পারেন। তাই স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য মসজিদ বা মন্দিরে না গিয়ে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণ

ভোগে সুখ নাই, কর্মেই প্রকৃত সুখ।

[৪৩তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ:

মহৎ কর্মের মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। সৎ ও সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটে। তাই ভোগে নয়, কর্মের মধ্যেই মানব জীবনে সার্থকতা নিহিত।

জগৎসংসারে ভোগ ও কর্ম দুটি বিপরীতমুখী দিক। ভোগ ও কর্ম সম্পাদনের দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত থাকে। মানুষ ভোগে আনন্দ পেলেও তৃপ্তি পায় না। কিন্তু সন্তোষজনক কর্মে আনন্দ ও তৃপ্তি দুটোই লাভ করা যায়। তাই ভোগে নয়, কর্মই জীবনের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনুষ্যত্বের কল্যাণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা ও শ্রেষ্ঠ। ভোগের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। ভোগ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে পঙ্কিলতা, গ্লানি ও কালিমার সঙ্গে। ভোগবাদীদের অর্জিত সম্পদ নিজের স্বার্থ ব্যতীত সমাজের অন্য কোনো কাজে আসে না। তাই, পরের দুঃখে তাদের হৃদয় মনও কাঁদে না। পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আদর্শ ও উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে। মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে পরার্থে, দীন-দুঃখীদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়।

স্বামী বিবেকানন্দ, মাদার তেরেসা, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ ব্যক্তির চরিত্র সৎকর্মের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ভোগ ও সুখ নিয়ে মানুষের নানারকম ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। সুখের জন্য অনেকেই বিলাসিতায় মত্ত হয়ে ওঠে এবং ভোগ বিলাসের নানা উপকরণের আয়োজন করে। কিন্তু কোনোভাবেই ভোগাকীর্ণ জীবন সুখের সন্ধান দেয় না। কেননা ভোগই যদি সুখের আকর হতো, তবে বিত্ত ও ক্ষমতাবানরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বলে গণ্য হতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এঁরাও জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারেন না। একমাত্র মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই সুখ পাওয়া যায়। দেশব্রতী, মানবব্রতী কর্মেই মানুষ লাভ করে জীবনের সার্থকতা।

জীবনের পরম শান্তি 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'র মধ্যে নিহিত। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে এবং দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে।

ভাব-সম্প্রসারণ

কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে,
আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়,
তার নাম কালচার।

[৪০তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানবমনের সকল প্রকার কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতা দূর করে; জীবনকে করে আলোকিত ও উদ্ভাসিত। আর অন্তরের সুপ্ত আলো বিকাশের মাধ্যমে যে শিক্ষার প্রকাশ তাই সংস্কৃতি।

বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। বিদ্যার্জনের মাধ্যমেই মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। বিদ্যা কুসংস্কার দূর করে মানুষের মনকে কলুষতামুক্ত করে তোলে। মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবিক শক্তির বিনাশ সাধন করে পূত-পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে। বিদ্যার এ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, বিদ্বান ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা কালচারে। নিজের জীবনকে ভালোভাবে পরিচালিত করতে, সুন্দর করতে, মহান করতে মানুষ কালচারের চর্চা করে। আর প্রকৃত বিদ্যার্জনের মাধ্যমেই মানুষ সংস্কৃতিবান হতে পারে। বিদ্যা মানুষের মধ্যে যে আচরণগত পরিবর্তন আনে তাই কালচার। হীরার পাথর আর তা থেকে বিচ্যুত আলোর যে সম্পর্ক, বিদ্যা ও কালচারের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। হীরা মূল্যবান পাথর। তা থেকে বিচ্যুত আলোক রশ্মির জন্যেই হীরার কদর এত বেশি। হীরা থেকে বিচ্যুত আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকের অন্ধকার দূর করে। বিদ্যাও হীরার অনুরূপ। বিদ্যার হিরন্ময় আলোক স্পর্শে মানব মনের সকল প্রকার কলুষ-কালিমা দূরীভূত হয়। বিদ্যা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তাকে মানবকল্যাণে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে। আর সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটায়। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সমাজের অন্য দশজনের মতো অন্ধভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করে না। তার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর একমাত্র যথার্থ বিদ্যাচর্চার মাধ্যমেই সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মনের এই যুক্তিবুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতার উদ্ভব ঘটে। স্বীয় কর্মগুণে যারা জগতে মহার্ঘ লাভ করেছেন, তারা সবাই ছিলেন যথার্থ বিদ্যা চর্চাকারী। বাস্তব জগতেও দেখা যায়, যে জাতি বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞানচর্চায় যত বেশি পারদর্শী, সে জাতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি অগ্রগামী।

সুতরাং মানবজীবনের যথার্থ বিকাশের জন্য এবং সুষ্ঠু সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে যথার্থ বিদ্যা চর্চা করতে হবে। তবেই সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে বিশ্ব মাঝারে বাঙালি জাতি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

ভাব-সম্প্রসারণ

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট
মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

[৩৭তম, ১৫তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: জ্ঞান যদি উদারতাপূর্ণ না হয়, বুদ্ধি তাহলে সংকুচিত এবং অসাড় হতে বাধ্য। আর এমন পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও চিন্তার মুক্তি সম্ভব নয়।

অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের প্রধান পার্থক্য কেবল চিন্তা ও বুদ্ধিতে। আদিকাল থেকে মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে নানা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এসেছে। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষ বর্তমানে সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। নিজ বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। এতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হয়েছে সহজ। যে মানুষ জ্ঞানচর্চা করে না, সমাজের নানা সংস্কার, সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা এসে তাকে আঁকড়ে ধরে। তার জীবনে কোনো উন্নতিই হয় না। মানুষ হয়েও সে ভারবাহী জীব সদৃশ জীবনযাপন করে। জ্ঞানহীন মানুষের কোনো মূল্য নেই। জ্ঞানচর্চা না করলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হতে পারে না। ফলে সে ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করতে পারে না। এ রকম মানুষের দ্বারা যেকোনো অন্যায় কাজ করা স্বাভাবিক। একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতাপস সে তার বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। সে তার বুদ্ধি-বৃত্তির মাধ্যমে নিজের এবং আশপাশের মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ব্যক্তিজীবনে যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতীয় জীবনেও অত্যাবশ্যকীয়। জ্ঞানচর্চা একটি দেশ ও জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার মুছে দিয়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। মুক্তবুদ্ধি চর্চা একটি দেশ ও জাতিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা দেয়। যে জাতির বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না, সে জাতি অন্ধকারে পড়ে থাকে। নানা অন্যায়, অবহেলা, কুসংস্কার তাদের ঘিরে ধরে। জ্ঞানহীন জাতির কোনো উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

বিবেকের জাগরণের মাধ্যমে পার্থিব মহাকল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দারিদ্র্য, কুসংস্কার-জড়তা থেকে মুক্তির জন্যে আমাদের জ্ঞানচর্চা করা উচিত।

ভাব-সম্প্রসারণ

অসি অপেক্ষা মসি অধিকতর শক্তিমান।

ভাব-সম্প্রসারণ: একবিংশ শতাব্দীতে মানবসম্প্রদায় আজ তার জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমেই জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষমতাকে ব্যাপৃত করেছে। এই মহাসন্ধিক্ষণে এখন আর কেউ অসি অর্থাৎ তরবারি চালানোর মাধ্যমে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাকে আশ্রয় নিতে হয় মসি অর্থাৎ কালি বা কলমের।

অসি অর্থাৎ তরবারির তীক্ষ্ণ ধারের কাছে অনেক কিছুই তুচ্ছ। তাই আক্ষরিক অর্থে অসিকেই সবচেয়ে শক্তিশালী জ্ঞান করবার কথা। কিন্তু কালের বিবর্তনে মসি অর্থাৎ কলমের কালির মাধ্যমে মানবমনের প্রকাশিত চিন্তন শক্তি এবং তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিকালদর্শী জ্ঞান করেছে। পৃথিবীর সূচনাকাল হতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। প্রারম্ভিক অবস্থায় মানুষ তার দৈহিক শক্তিকে পুঁজি করে প্রকৃতির সাথে নিয়ত সংগ্রাম করেছে। ক্রমে মানুষ পশুশক্তিকে জয় করার জন্য হাতিয়ারের আবিষ্কার ও ব্যবহার শিখেছে। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে মানুষের ব্যক্তিমালিকানার বলয় রেখা বৃদ্ধি করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অসি বা তরবারির বিক্রমে পররাজ্য গ্রাস, রাজ্য জয়, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য অসির নিচে পদানত। অসির নিচেই শাসিত হয়েছে অসংখ্য মানুষেরা। এতদসত্ত্বেও দৃশ্যমান বিবেচনায় অসির ক্ষমতা অধিকতর শক্তিমান রূপে দৃষ্ট হলেও ক্রমে মানুষ অসির ভয় উপেক্ষা করেই ভূলোকের মোড়ে মোড়ে সভ্যতা গড়েছে। জ্ঞানহীনতা ও মূর্খতা বিশিষ্ট শক্তির ব্যবহারে এখন আর রাজ্য চালনা কিংবা রাজ্য জয় সম্ভব নয়। অসির দেহে এখন মরিচার প্রলেপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কলমের খোঁচায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা পাল্টে দিয়েছে। এখন আর কেহ অসির ভয়ে ভীত নয়। মসির দেহে ভর করে মানুষ জয় করে চলেছে পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে আরেক গোলার্ধ। যে জাতির মসির গতি যত ক্ষিপ্রমাণ, তার উন্নতির চাকাও ততোধিক দ্রুত ঘূর্ণায়মান।

তাই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে এসে মানুষ তার বোধের দরজায় কড়া নেড়ে টের পায় অসির শক্তির বৃদ্ধির চেয়ে মসির শক্তি বৃদ্ধিই অধিকতর কল্যাণকর।

ভাব-সম্প্রসারণ

সুশিক্ষিত ব্যক্তি/লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

ভাব-সম্প্রসারণ: শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। জীবনের বাস্তবতায় মনের তাগিদে অর্জিত জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া সম্ভব।

শিক্ষা জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। জগৎ ও জীবনকে বাস্তব স্বরূপে চেনা-জানার জন্য এবং সর্বোপরি সামাজিক মানুষ হিসেবে মূল্যবোধ অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। অন্তরকে বিকশিত করাই এর উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবিক আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং নিজেকে জগৎ ও জীবনের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু এর পরিসর সীমিত। মানুষ প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে প্রয়োজনের তাগিদে নয়; অন্তরের প্রেরণায়। বিশ্বজোড়া পাঠশালা থেকে নিজের চেষ্টা, সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এ শিক্ষা অর্জিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের মনকে ধনের প্রতি আকৃষ্ট করে উপার্জনমুখী করে। ফলে মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য এ শিক্ষা অর্জনে বাধ্য হয়। এতে উপার্জনের পথ সুগম হলেও মানুষের আচরণের পরিবর্তন খুব একটা হয় না। তাই প্রায়শ দেখা যায়, বড় বড় ডিগ্রিধারী ব্যক্তি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মূর্খের মতো আচরণ করেন। আমাদের সমাজে এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের উচ্চতর ডিগ্রি আছে, কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে তারা কোনো অবদান রাখতে পারেননি। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের সুশিক্ষিত করতে পারেনি। ফলে জীর্ণ লোকাচার ও অন্ধ কুসংস্কারের দেয়াল ডিঙানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারা এই আধুনিক যুগের মানুষ হয়েও প্রাগ্রসর চিন্তার ধারক হতে পারেননি। এটি তাদের সুশিক্ষার অভাবের ফল। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ ডিগ্রি অর্জন না করেও সংস্কারমুক্ত জীবনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করে জগৎ ও জীবনকে আলোকিত করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটো, নিউটন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ ছিলেন স্বশিক্ষিত। তাঁরা জগৎ ও জীবন থেকে নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করে স্বশিক্ষিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা মরেও অমর। তাঁদের কীর্তিগাথা আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

নিজের চেষ্টায় অর্জিত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। স্বশিক্ষিত লোকের জ্ঞানের আলোই মানবজাতিকে আলোকিত জীবন ও ভুবনের সন্ধান দিতে পারে।

রচনা/প্রবন্ধ

'রচনা' শব্দের অর্থ কোনো কিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করা। কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তোলার নামই রচনা। রচনাকে সাধারণত সৃষ্টিশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বিষয়ের উপস্থাপনা, চিন্তার ধারাবাহিকতা, সংযত বর্ণনা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ থাকে।

'প্রবন্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' বলতে বিষয়বস্তু ও চিন্তার ধারাবাহিক বন্ধনকে বোঝায়। নাতিদীর্ঘ, সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ রচনার বিষয়, ভাব, ভাষা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত সাহিত্যের বিচারে রচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাধারণ বিচারে প্রবন্ধ ও রচনাকে সমধর্মী বলে মনে করা হয়।

❑ **রচনার বিভিন্ন অংশ:** রচনার প্রধান অংশ তিনটি – ক. ভূমিকা, খ. বিষয়বস্তু, গ. উপসংহার।

ক. ভূমিকা: এটি রচনার প্রবেশপথ। একে সূচনা, প্রারম্ভিকা বা প্রাক-কথনও বলা চলে। এতে যে বিষয়ে রচনা হবে, তার আভাস এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত।

[বি:দ্র: প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং উপসংহার কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু প্যারা দিয়ে লিখলেই হবে।]

খ. বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য: বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যই হচ্ছে রচনার প্রধান অংশ। এ অংশে রচনার মূল বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় স্পষ্ট করতে হয়। বিষয় বা ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি বেশি পয়েন্ট দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অনুচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য এ অংশে প্রয়োজনে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

গ. উপসংহার: বিষয়বস্তু আলোচনার পর এ অংশে একটা সিদ্ধান্তে আসা হয় বলে এটাকে 'উপসংহার' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বর্ণিত বিষয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত বা অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

❑ **রচনার শ্রেণিবিভাগ:** বিষয়বস্তু অনুসারে রচনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় – ক. বর্ণনামূলক রচনা, খ. চিন্তামূলক রচনা।

ক. বর্ণনামূলক রচনা: বর্ণনামূলক রচনা সাধারণত স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে থাকে। ধান, পাট, শরৎকাল, কাগজ, টেলিভিশন, বনভোজন, শৈশবস্মৃতি ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

খ. চিন্তামূলক রচনা: চিন্তামূলক রচনায় থাকে সাধারণত তত্ত্ব, তথ্য, ধ্যান-ধারণা, চেতনা ইত্যাদি। শ্রমের মর্যাদা, নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকার, পরিবেশ দূষণ, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি এই শ্রেণির রচনার মধ্যে পড়ে।

রচনা/প্রবন্ধ

❑ প্রবন্ধ-রচনার কৌশল:

০১. বর্ণনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি, রং, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ, অনুভূতি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে।

০২. বর্ণনামূলক রচনা লেখার সময় সময়সীমা এবং পরিসরের কথা মনে রেখে বিশেষ কিছু দিক বেছে নিতে হয়। সেগুলোর সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

০৩. রচনা লেখার সময় পরম্পরা বা ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। জানা বিষয় ছাড়াও অনেক সময় অজানা বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হতে পারে। বিষয়ের ধারণাগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ভাবের কোনো অসংগতি না থাকে।

০৪. প্রবন্ধ বা রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত রচনার দৈর্ঘ্য অনধিক ১৫০০-১৮০০ শব্দের মধ্যে হলে ভালো হয়। তবে পরীক্ষার কক্ষে কিংবা বিশেষ পরিবেশে বসে রচনা লেখার সময় শব্দ গুণে গুণে লেখা যায় না। এগুলো পূর্ব থেকে অভ্যাস করা ভালো। যেমন প্রতি লাইনে সাধারণভাবে কত শব্দ থাকে; সেই হিসেবে ১৫০০-১৮০০ শব্দ দিতে গেলে কত লাইন বা কত পাতা লেখা যায়, তা অনুশীলনের সময় হিসাব করে রাখা ভালো।

০৫. প্রবন্ধের ভাষা সহজ এবং প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ধিজাত শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, অপরিচিত বা অপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা ভালো। বাগাড়ম্বর বা অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করা হলে অনেক সময় বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষারীতির মাধ্যমে রচনাকে যথাসম্ভব রসমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করতে হয়।

০৬. প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং উপসংহার কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু প্যারা দিয়ে লিখলেই হবে তবে অন্যান্য প্যারাগুলোতে অবশ্যই হেডিং দিতে হবে।

❑ প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায়:

প্রবন্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক হতে পারে–

০১. প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ বা রচনা পড়তে হবে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা বিষয়ের ধারণা জন্মায় এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এতে লেখা সহজ হয়ে ওঠে।

০২. প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ানুগ, প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

০৩. ভাষারীতিতে সাধু এবং চলিত যেন মিশে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অযথা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়।

০৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়াও নিজের বক্তব্যকে আরো জোরালো করার জন্য প্রবাদ- প্রবচন, কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করা চলে।

০৫. নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তাশক্তি, পঠন- পাঠন, ভাষাগত দক্ষতা ও উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রবন্ধকে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করা উচিত।

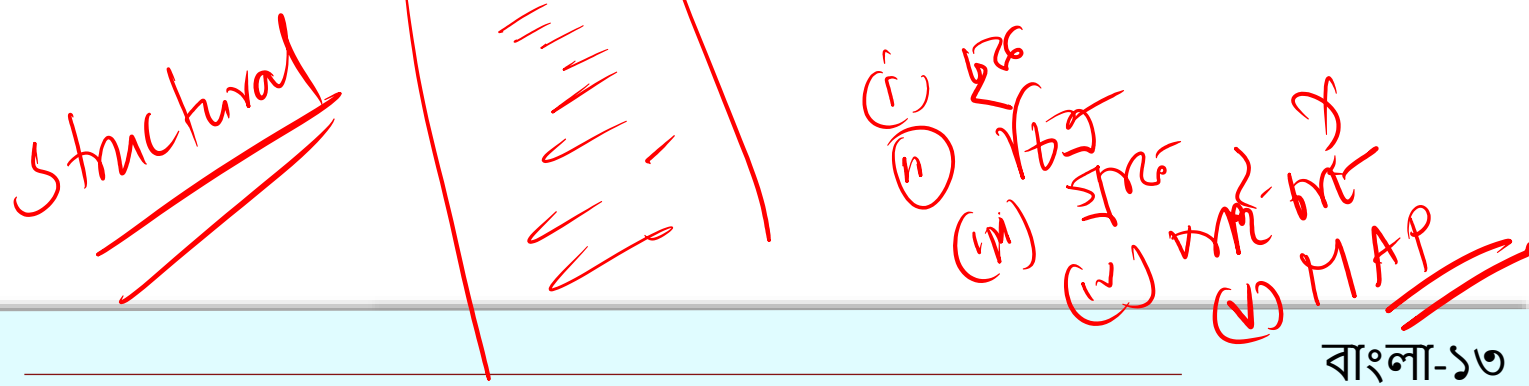

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) বাংলাদেশের কৃষির যান্ত্রিকীকরণ
(গ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার
(ঘ) রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বপরিস্থিতি
(ঙ) পদ্মা সেতু: বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪৩তম বিসিএস]

(ক) আমার ছেলেবেলা
(খ) আত্মশক্তি
(গ) দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়ন স্বপ্ন
(ঘ) বাংলাদেশের পুরাকীর্তি
(ঙ) কক্সবাজার

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন: [৪১তম বিসিএস]

(ক) মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান
(গ) সংক্রামক রোগ ও জনসচেতনতা
(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ
(ঙ) বৃদ্ধাশ্রম

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ যে কোনো একটি বিষয় প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪০তম বিসিএস]

(ক) উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
(খ) একজন মহীয়সী নারী
(গ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার
(ঙ) বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৮তম বিসিএস]

(ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
(খ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(গ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার
(ঘ) রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান
(ঙ) স্বদেশপ্রেম

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৭তম বিসিএস]

(ক) মানবসম্পদ
(খ) বাংলাদেশের নগরায়ন
(গ) সাইবার অপরাধ
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
(ঙ) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৬তম বিসিএস]

(ক) বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য
(খ) জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
(গ) শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য
(ঘ) বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় ও তার প্রতিকার
(ঙ) নারী উন্নয়ন

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৫তম বিসিএস]

(ক) দেশাত্ববোধ
(খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প
(গ) বার্ধক্য ও বৃদ্ধাশ্রম
(ঘ) সড়ক দুর্ঘটনা
(ঙ) যেদিন সবকিছু গোলমেলে

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

বিশ্ব অর্থনীতি IMF এর রিজার্ভ মুদ্রা ডলার, পাউন্ড, ইয়েন, ইউয়ান ও ইউরো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ডলারকেই সর্বজন গ্রাহ্য হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিটি দেশ। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী- মুদ্রা হলো ডলার। অন্যান্য মুদ্রার মান বাড়া বা কমা নির্ভর করে ডলারের দর পতনের উপর। সেজন্য প্রতিটি দেশ সবসময় রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে ডলার সংরক্ষণ করে রাখে। মূলত আমদানি ব্যয় মেটানো, দেশের আর্থিক বিপর্যয় মোকাবেলা, স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ, মুদ্রানীতি শক্তিশালীকরণ, বাজেট বাস্তবায়ন ও বৃহৎ প্রকল্পে অর্থের যোগানসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করতে এ ধরনের রিজার্ভ হাতে রাখে প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ডলার সংকটের প্রেক্ষাপট: করোনা মহামারি ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির এখন টালমাটাল অবস্থা। ২০১৯ সালে COVID-19 অতিমারির কারণে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। দীর্ঘ দুই বছর পর অর্থনীতি যখন চাঙ্গা হতে শুরু করলো তখনই শুরু হলো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করলে শুরু হয় নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞা যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

❑ **বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি:** গত দুই বছরে বিশ্বব্যাপী ডলারের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। ডলারের বিপরীতে অনেক দেশের মুদ্রামানের ব্যাপক দরপতন হয়েছে।

দেশ	মূল্যস্ফীতির হার	দেশ	মূল্যস্ফীতির হার
লেবানন	৩২২%	ভারত	৭.৫%
জিম্বাবুয়ে	২৫৫%	পাকিস্তান	৩৮%
ভেনেজুয়েলা	১৫৫%	শ্রীলংকা	১৫%
যুক্তরাষ্ট্র	৯.১%	বাংলাদেশ	৮.৮%
যুক্তরাজ্য	৯.৪%	চীন	৪.৯৮%

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

❑ **ডলার সংকটের কারণ:** অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বজুড়ে যে সংকট শুরু হয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বিশ্ব অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে ডলার সংকটের নিম্নোক্ত কারণ গুলো উল্লেখ করেছেন।

০১. করোনা মহামারি	০৮. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি
০২. রাশিয়া – ইউক্রেন যুদ্ধ	০৯. মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচার
০৩. আমদানি রপ্তানি ঘাটতি	১০. অতিরিক্ত ডলার মজুদ রাখা
০৪. সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি	১১. যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি
০৫. প্রবাসী আয় কমে যাওয়া	১২. রাশিয়াকে SWIFT থেকে বহিষ্কার করা
০৬. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ	১৩. রুবলের দরপতন
০৭. জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহ কমে যাওয়া	

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

❑ **ডলার সংকট নিরসনে বৈশ্বিক উদ্যোগ:** IMF ও বিশ্ব ব্যাংক যৌথভাবে ডলার সংকট সমাধানে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য IMF ও বিশ্ব ব্যাংক যে কাজগুলো করছে। তা হলো-

১. স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২. IMF এর Bailout এর মাধ্যমে ঋণ দিয়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করছে। যেমন: শ্রীলংকা ও পাকিস্তান।

৩. বাজেট সহায়তার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা। যেমন: বাংলাদেশ বাজেট সহায়তার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ১০০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা চেয়ে আবেদন করেছে।

৪. IMF এর Resilience and Sustainability Trust (RST) ফান্ড থেকে ঋণ প্রদান। যেমন: IMF এর RST ফান্ড থেকে প্রথম ঋণ পায় বার্বাডোজ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ঋণ পায় বাংলাদেশ ৪৭০ কোটি টাকা।

৫. উন্নত দেশগুলোর দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে দেওয়া বিভিন্ন প্রণোদনা।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

ডলার সংকট ও বাংলাদেশে এর প্রভাব: বিশ্বব্যাপী যে ডলার সংকট শুরু হয়েছে তার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও লক্ষ্য করা যায়। গত ২ বছরে ডলার প্রতি মূল্য ৮৪ টাকা থেকে বেড়ে ১০৬ টাকাতে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না হলে এর প্রভাব আরো দীর্ঘায়িত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক ডলার সংকটের কারণে যে প্রভাবগুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে-

১। **ইতিহাসে রেকর্ড পরিমান টাকার অবমূল্যায়ন:** Covid-19 ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত দুই বছরে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে মারাত্মক ভাবে। যার কারণে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের আমদানি খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। আর দ্রব্যমূল্যের এ ঊর্ধ্বগতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে স্বল্প, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের লোকেরা। নিচে গত কয়েক মাসে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমার চিত্রতে তুলে ধরা হলো-

সময়	টাকার মান (প্রতি ডলারে)
জানুয়ারি ২০২২	৮৬.০০ টাকা
মার্চ ২০২২	৮৬.০০ টাকা
এপ্রিল ২০২২	৮৬.৪৫ টাকা
মে ২০২২	৮৭.৫০ টাকা
সেপ্টেম্বর ২০২২	৯৫.৭৮ টাকা
জানুয়ারি ২০২৩	১০৬.৩৪ টাকা

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

২. **মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা মহামারি ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে প্রবাসী শ্রমিকের পরিমান ক্রমাগত কমছে। যার কারণে বাংলাদেশ রেমিটেন্স প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ মাত্রার মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে।

অর্থবছর	মূল্যস্ফীতির হার
২০১৮-১৯	৫.৪৮%
২০১৯-২০	৫.৬৫%
২০২০-২১	৫.৫৬%
২০২১-২২	৮.৮০%
২০২২-২৩	৯.১০% (হবে)

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

৩. **বাংলাদেশ ব্যাংকের রির্জাভে ঘাটতি:** বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে প্রতিদিন বাড়ছে আমদানি খরচ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ছিল ৯১.০৮ বিলিয়ন ডলারে যা গত বছর থেকে ২৭% বেশি। এ খরচ নির্বাহের জন্য রিজার্ভ থেকে সরকার অর্থ ব্যবহার করছে। যার কারণে রিজার্ভ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের রিজার্ভ ঘাটতির চিত্র-

সময়	রিজার্ভের পরিমাণ (বিলিয়ন ডলারে)
আগস্ট ২০২১	৪৮.৪৩
মার্চ ২০২২	৪৪.০০
ডিসেম্বর ২০২২	৩৩.০৪
ফেব্রুয়ারি ২০২৩	২৮.৫৭

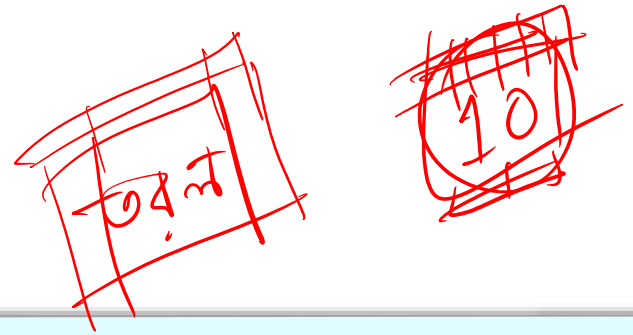

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

৪. **দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি:** খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, জ্বালানি তেল, গ্যাস, সিমেন্ট, রড, কাগজ, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তা পারতপক্ষে জনসাধারণের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. **ডলার সংকট প্রভাব ফেলছে ৫ শিল্প প্রতিষ্ঠানে:** BBC বাংলা প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বাংলাদেশে গত কয়েক মাস ধরেই ডলার সংকট, জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দেশের যে ৫টি প্রধান শিল্প ও উৎপাদন খাতে ডলার সংকটের প্রভাব বিরাজ করছে তা তুলে ধরা হলো-

ক. **ঔষধ শিল্প:** বর্তমান বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ঔষুধের ৯৮ শতাংশ দেশেই উৎপাদন হয়। কিন্তু এই শিল্পের কাঁচামালের ৮০-৮৫ শতাংশ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। প্রতিবছর গড়ে এই খাতে ১.৩ বিলিয়ন ডলারের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এ খরচ এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

খ. **সিমেন্ট শিল্প:** সিমেন্ট শিল্পের মালিকরা বলছেন পূর্বের চেয়ে ২০ শতাংশ খরচ বেড়েছে সিমেন্ট ক্রয়ে। গ্যাস ও জ্বালানি তেলের সংকটের কারণে তাদের উৎপাদন আগের চেয়ে কমে গেছে। যার কারণে অনেক কাঁচামাল অব্যবহৃত থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

গ. **হালকা প্রকৌশল শিল্প:** দাম বেড়েছে কিন্তু বিক্রি মাত্রাতিরিক্ত হারে কমেছে। বাংলাদেশে গাড়ির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে কৃষি ও নির্মাণ কাজের যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক পণ্যের ছাঁচ, নাট-বল্টু, বেয়ারিং ইত্যাদি এখন দেশেই তৈরি হয় কিন্তু কাঁচামাল হিসেবে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় যার মূল উৎস হলো রাশিয়া।

ঘ. **চামড়া শিল্প:** চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা। চামড়া দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা হলেও, প্রক্রিয়া করার কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সরকার আমদানিতে বিধি নিষেধ আরোপ করায় এ খাতের ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে পড়েছে ভাটা।

ঙ. **মুদ্রণ শিল্প:** ডলারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কাগজের দাম। প্রকাশক ও মুদ্রণ ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন গত কয়েক মাসে কাগজের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এমনকি বেশি টাকা দিলেও ভালো মানের কাগজ পাওয়া যাচ্ছেনা।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

বাংলাদেশে ডলার সংকটের কারণ: ডলার সংকটের কারণে বাংলাদেশে অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত তখন বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে ডলার সংকটের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করছেন। নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া।

২। প্রবাসী আয় কমে যাওয়া।

৩। উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে অধিক বরাদ্দ।

৪। ব্যাংকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমে যাওয়া।

৫। অর্থপাচার বা মানি লন্ডারিং এর কারণে।

৬। অতিরিক্ত অর্থ ছাপানো।

৭। আমদানি খরচ বৃদ্ধি।

৮। রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

০১. আর্থিক প্রণোদনা: Covid-19 এ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুলোকে আর্থিক প্রণোদনা দিয়েছেন। এছাড়াও দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, দিন মজুরদের এককালীন ২৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ প্রণোদনা দিয়েছে।

০২. প্রবাসী আয় কমে যাওয়া: প্রবাসী আয়ে বিশ্বে বাংলাদেশর অবস্থান ৭ম হলেও Covid-19 ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে প্রবাসী আয় প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রবাসী আয়ের অর্থ দিয়েই তার বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করে। এ বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করার জন্য বর্তমানে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ অর্থ থেকে সহায়তা নিচ্ছে। যার কারণে রিজার্ভের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নিচে গত তিন বছরের বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো-

প্রবাসী আয়	সাল
১৮.২১ বিলিয়ন	২০১৯-২০
২৪.৭৮ বিলিয়ন	২০২০-২১
২২.২১ বিলিয়ন	২০২১-২২

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

০৩. **উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ:** পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ অর্থ থেকে অর্থ সহায়তা নিয়েছে। এছাড়াও সকল উন্নয়ন প্রকল্প গুলোতে সরকার বাজেট থেকে প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে যার কারণে বাজেটে প্রতি বছর ঘাটতি থাকছে। আর এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক কিংবা সংস্থা থেকে ঋণ সহায়তা নিচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে টাকার অবমূল্যায়নের উপর।

০৪. **সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হ্রাস:** সরকার অর্থনৈতিক চাপ সামাল দিতে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে দিয়েছে যার কারণে বিনিয়োগকারীরা সঞ্চয় পত্র ভেঙ্গে টাকা উত্তোলন করে ফেলছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৫ লক্ষ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করলে পূর্বের থেকে কম হারে মুনাফা পাবে।

০৫. **অর্থ পাচার:** আমদানি রপ্তানির খরচ কাটছাট করে অবৈধভাবে অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে দেশে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণ বেশি দেখালেও প্রকৃত পক্ষে তা জনগণের হাতে নেই। যার কারণে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সাথে সামঞ্জস্য বিরাজ করছে না। আর এ অসামঞ্জস্যে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

০৬. **অতিরিক্ত অর্থ ছাপানো:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার তদারকি ভালোভাবে না করে বেশি বেশি অর্থ ছাপিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আর এ অর্থ ছাপানোর কারণেই বাজারে অর্থ সরবরাহ বেড়ে গেছে কিন্তু সে অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। যার কারণে উৎপাদন ও অর্থ সরবরাহে একটা বড় ব্যবধান হয়ে গেছে যা মূল্যস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করছে।

০৭. **আমদানি খরচ বৃদ্ধি:** বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। আর আমদানি নির্ভর দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ কে দিতে হচ্ছে বাড়তি আমদানি মূল্য। আমদানির এ বাড়তি মূল্য রপ্তানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর আমদানি রপ্তানি ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

❑ **সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ:** বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক মহামন্দা ও আর্থিক সংকটের হাত থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো-

i. IMF এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় বছরে দুইবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ii. প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বৈধ পথে প্রেরণ করলে ২.৫% হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

iii. বিলাসবহুল ২৭টি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ। যেমন: ব্যক্তিগত গাড়ি, অলংকার, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি।

iv. দশ হাজারের বেশি ডলার সঙ্গে রাখা যাবেনা। দশ হাজারের বেশি ডলার থাকলে নিকটস্থ বৈধ মানি এক্সচেঞ্জ বুথে জমা রাখতে হবে।

v. বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোকে 'Non-Resident Foreign Currencey Deposit' অ্যাকাউন্ট গুলোতে কমপক্ষে ৪-৫% সুদের হার অফার করার নির্দেশ দিয়েছে।

vi. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ সরবরাহ কমিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ডলার সংকট

i. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মূলধনের ১৫% বিদেশি মুদ্রা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যা পূর্বে ছিল ২০%।

ii. রিজার্ভ মুদ্রার উপর চাপ কমাতে ৫০ লাখ মার্কিন ডলার বা তার বেশি পরিমানের Letter of Credit (LC) খোলার আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবশ্যই জানাতে হবে।

"ডলার সংকট ও মূল্যস্ফীতি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়, সরকারি বেসরকারি সব বাণিজ্যিক ব্যাংককে এক সাথে কাজ করতে হবে।"

- আব্দুর রউফ তালুকদার (গর্ভনর), বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশেষে বলা যায়, বৈশ্বিক বিরূপ পরিস্থিতিতে ডলার সংকট সৃষ্টি হয়েছে এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, সংযম ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ সংকট অনেকটাই লাঘব করা সম্ভব। ডলার সংকট সমাধানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো নজরদারি বাড়াতে হবে। সুষ্ঠু তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই এ সংকট উত্তরণের সঠিক উপায় বলে মনে করি।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

ভূমিকা: "এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"

-- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শকে ধারণ করে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চান। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য চীনের 'সর্বজনীন পেনশন মডেল' অনুসরণ করে বাংলাদেশেও 'সর্বজনীন পেনশন' বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। সব শ্রেণির বয়স্ক নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা' ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে 'সর্বজনীন পেনশন' ব্যবস্থা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

পেনশন ও সর্বজনীন পেনশন: একজন সরকারি চাকরিজীবী চাকরি জীবন শেষে মাসিক ভিত্তিতে যে ভাতা পেয়ে থাকেন তা পেনশন নামে পরিচিত। কোনো ব্যক্তি তার চাকুরিতে নিযুক্ত থাকাকালে কিছু অর্থ একটি তহবিলে আলাদা করে যোগ করা হয় এবং সে তহবিল থেকেই ব্যক্তির অবসর গ্রহণের পরে সহায়তা প্রদান করা হয়। পেনশন পাওয়ার শর্ত হলো সরকারি নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট চাকরি কাল অতিবাহিত করতে হবে। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের বাইরে দেশের প্রায় সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে আনাই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা। এখানে মূলত সরকার দেশের সকল নাগরিকদের আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

সর্বজনীন পেনশন আইন: ১৮ থেকে ৫০ বছরের বয়স্ক নাগরিকদের পেনশনের আওতায় আনতে জাতীয় সংসদে ইতোমধ্যে "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থপনা বিল ২০২৩" পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬০ বছর বয়সের পর ব্যক্তি আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম. মোস্তফা কামালের মতে, "আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের প্রাপ্ত বয়স্কদের সবাইকে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনা হবে।"

সর্বজনীন পেনশন আইনে যা আছে: যেহেতু দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যেই সরকার 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' গ্রহণ করেছে। এ আইনে যা যা আছে–

- ☑ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ধার্যকৃত হারে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতা কর্তৃক নিরবচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদানের শর্তে তাঁর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে আজীবন বা পেনশনে থাকাকালীন চাঁদা মৃত্যুজনিত কারণে তার নমিনিকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসিক নির্ধারিত হারে পেনশন প্রদত্ত হবে।
- ☑ পরিচালনা পরিষদ গঠন ও কার্যাবলি
- ☑ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল গঠন
- ☑ সদস্যদের ঋণ গ্রহণে ক্ষমতা

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

- ☑ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
- ☑ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা কীভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন হবে।
- ☑ কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ☑ তহবিলের অর্থের হিসাব ও নিরীক্ষা

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা: 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর অধীন একটি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যার নাম হবে 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ'প্এই কর্তৃপক্ষের স্থায়ী সিলমোহর থাকবে।

ক্ষমতা: তহবিলের স্থাবর, অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকার রাখবার বা হস্তান্তর করবার ক্ষমতা শুধু জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং এটি নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

পেনশন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব: 'সর্বজনীন পেনশন ২০২৩' আইনে পেনশন কর্তৃপক্ষের যে সব দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে–

ক. সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

খ. সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির আওতায় উহার চাঁদা দাতাগণের স্বার্থ সংরক্ষণ।

গ. সর্বজনীন পেনশন স্কিম গ্রহণ, স্কিমে প্রবেশ যোগ্যতা, শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন, স্কিম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

ঘ. পেনশন স্কিমে চাঁদা দাতাগণের জমাকৃত অর্থের সুরক্ষা নিশ্চতকরণ।

ঙ. চাঁদা দাতাগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করা।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল গঠন: 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল' নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হবে।

ক. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

খ. এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য ফি ও চার্জ।

গ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ।

ঙ. অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

এই অর্থগুলো কর্তৃপক্ষের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হবে। কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন করা হবে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা: 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর ১৪ অনুচ্ছেদে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যথা:

১. জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৮-৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিক সর্বজনীন পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৫০ ঊর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২. একজন চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং চাঁদা দাতার বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন তহবিল পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন প্রদান করা হবে।

৩. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীগণ এই কর্মসূচিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

৪. সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছাধীন থাকবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

৫. প্রত্যেক চাঁদা দাতার জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র পেনশন হিসাব থাকবে, যা বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে।

৬. চাকুরিরত চাঁদা দাতাগণ চাকুরি পরিবর্তন করলেও পূর্ববর্তী হিসাব নতুন কর্মস্থলের বিপরীতে স্থানান্তরিত হবে, নতুনভাবে হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না।

৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারিত হবে।

৮. মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করা যাবে এবং অগ্রিম অথবা কিস্তিতে টাকা জমা দানের সুযোগ থাকবে।

৯. মাসিক চাঁদা প্রদানে বিলম্ব হলে, বিলম্ব ফিসহ বকেয়া চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে পেনশন হিসাব সচল রাখা যাবে এবং উক্ত বিলম্ব ফি চাঁদা দাতার নিজ হিসাবেই জমা হবে।

১০. পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।

১১. পেনশনে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কাল (মূল পেনশনারের ৭৫ বছর বয়স) পর্যন্ত মাসিক পেনশন পাবেন।

১২. চাঁদা দাতার কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করার পূর্বে মারা গেলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনি কে ফেরত দেওয়া হবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

১৩. পেনশন তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোনো পর্যায় এককালীন উত্তোলনের প্রয়োজন হলে চাঁদা দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন। যা চাঁদাদাতার নিজ হিসাবে জমা হবে।

১৪. মাসিক প্রদত্ত চাঁদা আয়কর মুক্ত হবে।

১৫. সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রজ্ঞাপন জারি হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন আয় সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা অস্বচ্ছল চাঁদা দাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করতে পারবে।

[**নোট:** সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে সরকারি, আধাসরকারি স্বায়ত্তশাসিত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।]

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত থাকবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

সর্বজনীন পেনশনের প্রয়োজনীয়তা: "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বিধবা, মাতা-পিতাহীন বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার"– [অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।]

বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেণ্ডে প্রবেশ করেছে যা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এসব কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনয়ন করা প্রয়োজন।

১. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:** অবসর সময়ে প্রতিটি নাগরিক নিরাপত্তা চায়। আর নিরাপত্তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। সরকার এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্তা চালু করেছে। প্রতিটি নাগরিক তার অবসর জীবনে সর্বজনীন পেনশন তহবিল থেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাবে।

২. **জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি:** মানুষের জীবন যাত্রার মান উঠানামা করে অর্থনৈতিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় শতকরা ৮০ জনই হলো নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষ। এ মানুষগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সকল মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হলে সরকারের প্রয়োজন অধিক তহবিল। সরকার এ সর্বজনীন পেনশন ফান্ডের মাধ্যমে এ ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জীবন মানের কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করতে পারবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

৩. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** সরকার সর্বজনীন পেনশন ফান্ডের গচ্ছিত টাকা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে তেমনি অলস অর্থের সঠিক ব্যবহারও হবে।

৪. **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** বিদেশি ঋণ যেমন: IMF, Word Bank, ADB কিংবা উন্নত দেশগুলো থেকে প্রদত্ত ঋণ এড়িয়ে নিজেদের অর্থেই নিজেদের চাহিদা মেটানো সম্ভব। নিজেদের অলস অর্থ ফেলে না রেখে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক ব্যবহার করা যাবে।

৫. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়ন:** দেশের দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়নের জন্য সরকারও তহবিল ব্যবহার করবে। ফলে দেশের দরিদ্রতার হার যেমন হ্রাস পাবে তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মানেরও উন্নয়ন ঘটবে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে সুশীল সমাজের মতামত: সর্বজনীন পেনশন স্কিমে কোনো নাগরিককেই বাদ দেয়া যায় না। এটি একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জাল হিসাবে কাজ করে। করোনার পরে সর্বজনীন পেনশন বিষয়টি অনেক দেশেই গুরুত্ব পাচ্ছে। যাদের আয় কম, তাদেরকে এই পেনশনের আওতায় রাখতে হবে এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমাও থাকা উচিত নয়।”

––অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

“সরকার যে সর্বজনীন পেনশনের কথা বলছে সেটা আসলে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা। যেখানে সদস্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ জমা রাখবে তার বিপরীতে সরকারও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখবে এবং সময় শেষে পেনশন হিসাবে প্রদান করবে। এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ।” -- ড. নাজনীন আহমেদ, কান্ট্রি ইকোনমিস্ট, UNDP.

“এখানে তো বড় আকারের একটা ফাণ্ড গঠন হবে। সেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কীভাবে বিনিয়োগ হবে, সেটার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবেপ্ন তিনি আরো বলেন এই পেনশনের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, পুরো ব্যবস্থাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে নজরদারি করা। দ্বিতীয়ত, যে কর্তৃপক্ষ থাকবে তারা যাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে নিতে পারেন সেটা দেখা। তৃতীয়ত, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা”

-- ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অর্থনীতিবিদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ: COVID-19 ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন হতে পারে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে হবে–

- সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ।
- সর্বজনীন পেনশন তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতির মাধ্যমে যেন এই তহবিল ব্যবহার না হয়।
- বিনিয়োগ করা, বিনিয়োগকৃত অর্থ মুনাফাসহ উঠানো যাবে কিনা তা নিশ্চিত করে বিনিয়োগ।
- সদস্য ও কর্তৃপক্ষের মাঝে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- সকল নাগরিককে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

পরামর্শ: অর্থনীতি বিশ্লেষক ও সুশীল সমাজের মতামত পর্যবেক্ষণ করলে যে সুপারিশগুলো দাড় করানো যায়--

- পুরো ব্যবস্থাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিয়ে আসা যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।
- কর্তৃপক্ষ বোর্ডে যারা থাকবে তাঁরা যেন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা তদারকি করা।
- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা যেন হয় নাগরিকের একটি অধিকার। যে অধিকার পালনে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে।
- কর ব্যবস্থার সঙ্গে পেনশনকে যুক্ত করা হলে দেশে করদাতার সংখ্য বাড়বে এবং সরকারের রাজস্বও বাড়বে।
- প্রতিটি নাগরিক যেমন: অস্বচ্ছল, দরিদ্র, সরকারি, বেসরকারি কর্মচারী সকলে যেন সমান মর্যাদা পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপসংহার: সর্বোপরি, এই বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমন অর্থ সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ থাকবে তেমনি থাকবে তা বাস্তবায়নেরও। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার এর সঠিক বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে বলে আমি মনে করি। আর এজন্য প্রয়োজন সরকারের পাশাপাশি নাগরিক, সুশীল সমাজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা। আশা করা যায়, এটি নিশ্চিত হলে বাংলাদেশ চীনের মতো 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা' সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে এবং এর সুফল দেশের প্রতিটি নাগরিক ভোগ করতে পারবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

সর্বজনীন পেনশন চালু:

- জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে অন্তর্ভুক্তির বয়স: ১৮-৫০ বছর।
- বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর ঊর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে স্কিমে অংশগ্রহণের তারিখ হতে ১০ বছর চাঁদা প্রদান শেষে তিনি যে বয়সে উপনীত হবেন সে বয়স হতে আজীবন পেনশন পাবেন।
- সরকারি নির্দেশনা ব্যতীত সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ সরকারি পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- বিদেশে কর্মরত দেশি কর্মীরা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।
- জমাকৃত অর্থ একবারে উত্তোলন করা যাবে না।
- পেনশন শুরু: ৬০ বছর পেরোলে।
- ঋণ সুবিধা: জমানো টাকার ৫০%।
- চাঁদার টাকা: কর রেয়াত সুবিধা।
- পেনশন: আয়করমুক্ত।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

চাঁদা জমা

- মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক।
- টানা ১০ বছর দিতে হবে।
- মাস পার হলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য বিলম্ব ফি ১%।
- টানা তিন কিস্তি না দিলে পেনশন স্থগিত।
- চাঁদার টাকা অগ্রিম জমা দেওয়া যাবে।
- কর্মহীন হলে অসচ্ছল চাঁদাদাতা ঘোষণার আবেদন।
- ব্যাংক, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস।

নমিনি

- বেঁচে থাকলে আজীবন পেনশন, ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের (পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) জন্য মাসিক পেনশন পাবেন।
- নমিনি মারা গেলে নতুন নমিনি মনোনয়ন।
- পেনশনার ও নমিনি মারা গেলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ও উত্তরাধিকার সনদের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী পেনশন পাবেন।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

অনলাইনে নিবন্ধন

- www.upension.gov.bd ওয়েবসাইটে।
- ভুল তথ্য দিলে বাতিল।
- অনলাইন ফরম পূরণ অথবা সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে নিবন্ধন করা যাবে এবং চাঁদা দেওয়া যাবে।

৪টি আলাদা স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এগুলো হলো- প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা।

প্রবাস: বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিক নিম্নে উল্লেখিত চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদানপূর্বক এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন, তবে পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন পাবেন। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা দিয়ে মুনাফা ছাড়াও ২.৫% প্রণোদনা পাবেন।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

প্রগতি: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কর্মচারীগণের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মচারী এবং অবশিষ্ট ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই স্কিমে অংশগ্রহণ না করলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারি নিজ উদ্যোগে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সুরক্ষা: অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেমন- কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে তাঁতি, ইত্যাদি নিম্নে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সমতা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ [যাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা] নিম্নে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সমতা স্কিমে কর্তৃপক্ষ সমপরিমাণ অর্থ জমা করবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় থাকা ব্যক্তিগণ তাদের জন্য প্রযোজ্য স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্কিমে অংশগ্রহণ করার আগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা অর্পণ করতে হবে।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়